Vol. 32 | No. 2 | 1989

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

মীর মশাররফ হোসেনের ‘সঙ্গীত লহরী’

Volume	32
Issue	2
Year	1989
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	জাহাঙ্গীর চৌধুরী
Published online	July 8, 2025
DOI	10.62328/sp.v32i2.6
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v32i2.6
Pages	89-108
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

মীর মশাররফ হোসেনের 'সঙ্গীত লহরী'

জাহাঙ্গীর চৌধুরী

'সঙ্গীত লহরী' মীর মশাররফ হোসেনের দ্বিতীয় পদ্য গ্রন্থ এবং কালানুক্রম হিসেবে সপ্তম গ্রন্থ।[১] প্রকাশকাল ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দ। বইটির মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৮ ; মোট গানের সংখ্যা ৮৮ এবং মুদ্রণ সংখ্যা ১০০০।[২] 'সঙ্গীত লহরী' লেখকের খণ্ড কবিতা ও গান রচনার নিদর্শন। এতে কোন গদ্য রচনা নেই, নেই কোন ভূমিকা। গ্রন্থের শুরু থেকেই ক্রমিক সংখ্যা দিয়ে একটির পর একটি গান ছাপা হয়েছে। গানগুলোর নাম দেয়া হয়নি, নম্বর দেওয়া হয়েছে এবং কোন কোন গানের সুর ও তাল নির্দেশ করা হয়েছে। গীতি-কবিতা হিসেবেও এগুলি সুখপাঠ্য।[৩] 'বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ' থেকে 'সঙ্গীত লহরী' সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য জানা যায়। যেমন : (ক) প্রকাশকাল ৪ঠা আগস্ট, ১৮৮৭। (খ) মুদ্রণ সংখ্যা ১০০০। (গ) গ্রন্থস্বত্ব মীর মশাররফ হোসেন (ময়মনসিংহ)।[৪] এ থেকে জানা যাচ্ছে 'সঙ্গীত লহরী'র প্রকাশ কালে, অর্থাৎ ১৮৮৭ সালে মীর সাহেব তাঁর চাকরীস্থল দেলদুয়ারে (ময়মনসিংহ) ছিলেন।

'সঙ্গীত লহরী'র প্রথম পরিচয় পাওয়া যায় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সাহিত্য-সাধক চরিতমালা' গ্রন্থে।[৫] তিনি মশাররফ হোসেনের জীবন ও সাহিত্যকর্মের পরিচয় দিতে গিয়ে 'সঙ্গীত লহরী'র প্রকাশকাল, পৃষ্ঠা সংখ্যা ও মীরের রচনার নিদর্শন স্বরূপ তা থেকে চারটি গান উদ্ধৃত করেছেন। মীরের জীবন ও সাহিত্যকর্ম নিয়ে যাঁরা আলোচনা করেছেন 'সঙ্গীত লহরী' সম্পর্কে তাঁদের কেউ এ যাবতকাল ব্রজেন্দ্রনাথ-অতিরেক কোন তথ্য-পরিবেশনে সক্ষম হননি। প্রত্যেকেই ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তথ্য-সংকেতের ভিত্তিতে গ্রন্থটির ইঙ্গিতধর্মী পরিচয় দানের চেষ্টা করেছেন। সম্প্রতি কুষ্টিয়া থেকে অধ্যাপক আবুল আহসান চৌধুরী গ্রন্থটি সংগ্রহ করে তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশ করেন।[৬]

'সঙ্গীত লহরী'র কোন প্রত্যক্ষ সমালোচনা কোথাও পাওয়া যায়নি। কিন্তু এ সম্পর্কে বেঙ্গল লাইব্রেরীর তদানীন্তন ভারপ্রাপ্ত লাইব্রেরীয়ান

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৮৮৭ সালের বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগের পরিশিষ্টে সাল-তামাসী রিপোর্টে যে মন্তব্য করেছিলেন তা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ :

> Whatever Mir Mosharruf writes deserves attention... the collection of his short poetical pieces may be ranked in point of style and language with those of the best Bengali poets of the day.[৭]

'সঙ্গীত লহরী' সম্পর্কে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর এই প্রশংসাসূচক উক্তি মীর মশাররফ হোসেনের জন্যে কম গৌরবের কথা নয়। মশাররফ হোসেনের এ রূপ প্রশংসাও ইতিপূর্বে আর কেউ করেননি। কিন্তু শুধু প্রশংসা নয় 'সঙ্গীত লহরী'র বিরূপ সমালোচনার সন্ধানও পাওয়া যায়। মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমদ সম্পাদিত 'সুধাকর' পত্রিকায় (৯ চৈত্র ১২৯৬)'মীর সাহেবের ধর্ম্ম বিশ্বাস' শীর্ষক প্রবন্ধে সঙ্গীত লহরীর একটি গানের[৮] উদ্ধৃতি দিয়ে মশাররফ হোসেনের 'উদার মতে'র ব্যঙ্গ করা হয়। শুধু তাই নয়, লেখকের 'মশা' নামেরও ব্যঙ্গ করা হয় কঠোরভাবে। এই গ্রন্থের অধিকাংশ গানে মশাররফ হোসেন ভণিতায় সংক্ষিপ্ত নাম 'মশা' ব্যবহার করেছেন। তাই 'সুধাকর' ব্যঙ্গচ্ছলে লিখেন—"পাঠক! এ মানুষ বা গবাদি দংশনকারী ছোটখাট মশা নয়; ইনি ইসলাম ধর্ম্মে আঘাতকারী দ্বিহস্ত দ্বিপদ বিশিষ্ট মনুষ্যরূপ বৃহৎ মশা ওরফে মীর মশাররফ হোসেন।"[৯]

বি. এল. সি. 'সঙ্গীত লহরী'র পরিচিতি উল্লেখ করতে গিয়ে একে মন্তব্য করেছেন—*Songs on a Variety of Subjects*. সঙ্গীত লহরী'তে বিভিন্ন মেজাজ ও ঢংয়ে সর্বমোট ৮৮ টি গান সংকলিত হয়েছে। এর অনেক গান পূর্বে তাঁর কোন কোন গ্রন্থে—বিশেষ করে নাটক এবং প্রহসনে ব্যবহৃত হয়েছে। এতে মনে হয় তাঁর সঙ্গীত রচনার প্রাথমিক প্রয়োজন সম্ভবতঃ নাট্যরচনার জন্যেই অনুভূত হয়েছিল। উত্তরাধিকার ও পারি-পার্শ্বিকতা সূত্রে তাঁর মধ্যে সঙ্গীতানুরাগ জন্ম নেয়। মীর পরিবারে সঙ্গীতের চর্চা ছিল, মশাররফ হোসেনের পিতা সঙ্গীত চর্চা করতেন।। পদমদীর নবাব মীর মহাম্মদ আলীও গীতবাদ্য প্রিয় ছিলেন। নবাবের সঙ্গে এ সব আনন্দোৎসবে অংশগ্রহণের ভাগ্য মশাররফ হোসেনের অনেক বার ঘটেছে। মশাররফ হোসেনের প্রিয়তমা স্ত্রী বিবি কুলসুমও সঙ্গীতের বিশেষ ভক্ত ছিলেন। আলোচ্য গ্রন্থে সঙ্গীতের বিভিন্ন সুর ও তাল ইত্যাদির

প্রয়োগে এটা ধারণা করা যায় যে, সঙ্গীতের উপর মীরের যথেষ্ট দখলও ছিল। তবে সঙ্গীতের প্রতি তাঁর দুর্বলতা থাকলেও এই সম্ভাবনাকে প্রোজ্জ্বল করে তুলেছে সম্ভবতঃ ফিকির চাঁদের দল। 'সঙ্গীত লহরী'র গানগুলোকে চরিত্রানুযায়ী নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা যায়। যেমন :

(ক) প্রেম-বিরহমূলক গীতিগুচ্ছ

(খ) স্বাদেশিকতায় প্রোজ্জ্বল জাতীয় উদ্দীপনামূলক সঙ্গীত

(গ) রাজপ্রীতিজাত প্রশস্তিগীত

(ঘ) হাস্যরসাত্মক, রঙ্গব্যঙ্গমূলক গীতিগুচ্ছ

(ঙ) মিশ্রভাবের গান

(চ) অধ্যাত্মবাদ সমৃদ্ধ বাউল গান

গ্রন্থের গানগুলোর মধ্যে প্রেম-বিরহমূলক গীতিগুচ্ছের সংখ্যাই বেশী। 'সঙ্গীত লহরী'র সূচনাই এই প্রেম-বিরহমূলক গান দিয়ে এবং এর প্রায় তিন-চতুর্থাংশ গানই এই জাতীয়। এই গানগুলির লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হলো—এর অধিকাংশই বিচ্ছেদ জনিত হাহাকারে পূর্ণ। এ প্রসঙ্গে বেশী উদাহরণ না দিয়ে তাঁর প্রথম গানটি উদ্ধৃত করাই যথেষ্ট বলে মনে হয়।

রাগিনী—বসন্তবাহার ; তাল-আড়া।

ফুটিল বসন্ত ফুল, মোহন কাননে। (সেই)
দহিছে বিরহীর প্রাণ, বিচ্ছেদ দহনে ॥
পিক বঁধু পাখী পরে,
কুহরে পঞ্চম স্বরে,
শুনে প্রাণ হু হু করে
বিয়োগী মরে জীবনে ॥

প্রেম-বিরহমূলক গীতিগুচ্ছের পাশাপাশি স্থান পেয়েছে তাঁর স্বাদেশিকতায় প্রোজ্জ্বল জাতীয় উদ্দীপনামূলক সঙ্গীতসমূহ। যেমন এই গ্রন্থের সর্বশেষ গানে স্বাদেশিকতার ভাব এবং জাতীয় উদ্দীপনা জাগ্রত করে এভাবে—

ওরে ভারত জাগ জাগ দিন গেল
ঘুমের ঘোরে থেকে তোমার সর্ব্বনাশ হইল ॥
(তোমার) টাকা কড়ি হিরামতি যা যেখানে ছিল।
যে পেল সে লুটে পুটে আপন ঘর ভরিল রে ॥
যাদের নামে কাঁপিয়াছে বাসুকি পাতালে।
এখন তাদের বুকে মারছে লাথি বানরের দলেরে ॥
... ...
যা দেখেছ আছে এখন তারও কিছু নাই
সুখের দফা শেষ করেছে বিড়াল চোখ ভাইরে ॥
... ...
মৃত্যুজীব জাগিতেছে গলাবাজীর বোলে
ভারত সভা জাতি সভা হচ্ছে দলে দলে রে ॥
নাই ভেদাভেদ কোন প্রভেদ হিন্দু মুসলমান।
ক্রমে ক্রমে হইতেছে একদেহ এক প্রাণ রে ॥
দিনে দিনে বাড়তেছে বি. এ. এম. এ.-র দল।
মেয়েরা সব শিক্ষা লাভে হয়েছে পাগল রে ॥
জাগ জাগ ওরে ভারত ঘুমিওনা আর।
তোমার ছেলে তোমার মেয়ে সকলই তোমার রে।

উল্লেখ্য, জাতীয় উদ্দীপনার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মিলনের আকাঙ্ক্ষাও এতে ব্যক্ত হয়েছে। স্বাধীনতার স্পৃহাও বিবৃত হয়েছে কয়েকটি গানে। যেমন ১১ সংখ্যক গানে আছে—

সুখী বলে কোনজন
অধীনতা পাশে বাঁধা যাদেরি চরণ ॥

পরাধীনতা এই গ্লানিবোধে, বিষাদ সিন্ধু'র এজিদের প্রধানমন্ত্রী হামানের উক্তিরই প্রতিধ্বনি শুনা যায়। মীর মশাররফ হোসেন স্বাদেশিকতা এবং জাতীয় উদ্দীপনামূলক গান যেমন লিখেছেন, তেমনি আবার ইংরেজের প্রশস্তিও গেয়েছেন অবলীলায়। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রশংসায় হয়েছেন পঞ্চমুখ। যেমন ১৫ সংখ্যক গানে আছে—

কাতরে ডাকি মা তোরে, শুন মা ভারতেশ্বরী।
অবিহিত অবিচারে আর বাঁচিনে, মরি মরি ॥

থাকমা সাগর পারে,
কভু না হেরি তোমারে,
রক্ষ মা—প্রজাকিংকরে,
বিনয়ে মিনতি করি ।।

দয়া মমতা পালিনী,
প্রজার দুঃখ বিমোচিনী,
দীন-দুঃখ নাশিনী,
মা তুমি শুভংকরী ।।

জননী বলিয়ে ডাকি, শুন সিন্ধুপারে থাকি ।
করুণা কটাক্ষ রাখি, তার মা ভারতেশ্বরী ।।

এতে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'নীলকর', 'দুর্ভিক্ষ' ইত্যাদি কবিতার অনুরূপ ভাব ও সুর পরিলক্ষিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকরে'র সঙ্গে মশাররফ হোসেনের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল। 'সঙ্গীত লহরী'র ৫০ সংখ্যক গানেও প্রায় একই সুর ধ্বনিত। ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় শ্রী শ্রীমতি ভারতেশ্বরীর জুবিলী উপলক্ষে এটি রচিত হয়েছিল :

জয় মা ভারতেশ্বরী, জয় মা তোমারই রে
তব রাজ্য মাঝে সূর্য্য, কভু অস্ত নাহিরে ।
... ...
গাওরে ভারতীগণ, হয়ে একতান মন,
ভিক্টোরিয়া গুণ গান, মনপ্রাণ হ'তেরে ।।
এস হিন্দু মুসলমান, কেন আর অভিমান,
জাতি হিংসা ধর্ম্মদ্বেষ, ভুলি আজি সবেরে ।।
আয় ভাই দুহাত তুলে, প্রার্থনা করি সকলে;
থাক, মায়ের রাজ অটলে, যদ্দিন জগৎ রয়রে ।।

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, ইংরেজের বিরুদ্ধে জাতীয় উদ্দীপনা-মূলক গানে যেমন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা আছে, অনুরূপ ইংরেজের প্রশংসা-গীতিতেও হিন্দু মুসলমানের মিলনের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়েছে। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে সকল পর্যায়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির গানই তিনি গেয়েছেন। ভিক্টোরিয়া মাতার প্রশংসা প্রসঙ্গে আমাদের স্মরণে পড়ে 'ফিকির চাঁদের'

দলের কথা। তখন ফিকির চাঁদের দলে কাঙাল হরিনাথ নিজে এবং তাঁর দলের অন্যান্য সকলে গান রচনা করে সুরসহযোগে দিগ্‌দিগন্তপ্লাবিত করে দিয়েছিল। তখন এই সকল গান বেশ জনপ্রিয়ও হয়ে উঠেছিল। তবে ইংরেজ রাজ এবং রাজশক্তি সম্পর্কে তখনও তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী স্বচ্ছরূপ লাভ করেনি। ইংরেজ এসেছে আসুক, 'যোদ্ধা, শিক্ষিত, সুশৃংখল বৈজ্ঞানিক জাতি তাঁরা।' ভারতের অসহায় জনগণের প্রতি তাঁরা যত্নশীল হোক এই ছিল ফিকির চাঁদের দলের প্রার্থনা। তাই (তাঁদের দৃষ্টিতে) সুশাসক প্রজা-বৎসল লর্ড রিপন যখন সস্ত্রীক স্বদেশ যাত্রা করেন (১৮৮৪) তখন তাঁরা (ফিকির চাঁদের দল) পোড়াদহ স্টেশনে গিয়ে 'জয় রিপনের জয়' বলে আকাশ বাতাস মুখরিত করে তোলেন। এই উপলক্ষে তাঁরা একটি সুদীর্ঘ গানও রচনা করেছিলেন। তার কয়েকটি চরণ নিম্নরূপ :

ভিক্টোরিয়া মাতা যখন জিজ্ঞাসিবে বল তখন
কেবল নাম রয়েছে সোনার ভারত সকল হারায়েছে,
দুর্ভিক্ষ প্রতি বছরে অন্ন বিনা প্রজা মরে
... ...
রাজ রাজেশ্বরী হয়ে থাকুন মাতা ভিক্টোরিয়া
এ অত্যাচার দয়া করে করুন নিবারণ।
কাঙাল ফকিরের এই ভিক্ষে কাতর নিবেদন ॥

মুদ্রিত গানগুলি ট্রেনের কামরায় কামরায় বিলি করা হয়েছিল এবং পরে গানটি কলিকাতা বড় লাটের নিকট পৌঁছানো হয়েছিল। উল্লেখ্য যে, লাটভবন থেকে এর প্রশংসাসূচক উত্তরও তাঁরা পেয়েছিলেন।[১০]

'ফিকির চাঁদে'র দলের এই গান রচিত হয়েছিল ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে আর মীরের সঙ্গীত লহরী প্রকাশিত হয় ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দে। ফিকির চাঁদের দলের সঙ্গে মীরের সম্পর্ক ছিল একথাও আমরা জানি। সুতরাং মীরের রাজ-ভক্তিমূলক, বিশেষতঃ রানী ভিক্টোরিয়ার প্রশংসামূলক গান রচনার পেছনে ফিকির চাঁদের দলের প্রভাব কাজ করেছে বলে আমাদের ধারণা। এ ছাড়া 'সঙ্গীত লহরী'র ৮৮ সংখ্যক গানটিতে মীরের উপর ফিকির চাঁদের দলের প্রত্যক্ষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। মীরের রাজভক্তিমূলক গানে একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়, তা হলো, আঞ্চলিক সমস্যা নিয়ে চিন্তা এবং আঞ্চলিক সমস্যার উপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ। সমগ্র রাজনৈতিক সমস্যা, দেশীয় আন্তর্জাতিক

সমস্যা নয়— আঞ্চলিক সমস্যাই তাঁকে বেশী ভাবে পীড়িত, ভাবিত ও আলোড়িত করে তুলেছিল। এর মধ্যে জমীদারের পীড়ন এবং নীলকরদের অমানবিক অত্যাচারই প্রধান। তাঁর পরিচালিত 'হিতকরী' পত্রিকায় এর কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। তবে সাধারণ মানুষের প্রতি মমত্ববোধ, প্রজা-পীড়নে পীড়িত ও আলোড়িত হবার পেছনে কাঙাল হরিনাথের 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' তাঁর উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল বলে আমাদের ধারণা।

কাঙাল হরিনাথের 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা'য় উৎপীড়িত, নিপীড়িত দীন-দুঃখী প্রজা সাধারণের কথা স্থান পেত। কাঙাল হরিনাথের এই অবদানের কথা পরিষ্কার ফুটে উঠেছে 'মানসী' পত্রিকায় শ্রীযুক্ত শরচচন্দ্র চৌধুরীর একটি কবিতায় :

যখন বঙ্গের গ্রামে দীন প্রজাগণ—
উৎপীড়ন অত্যাচার নীরবে সহিত ;
না জানিত রাজদ্বারে করিতে রোদন,
নিজের অভাব নিজে বুঝিতে নারিত ;
সে সময়ে হরিনাথ বীরের মতন
অনন্য সহায় ঘোর যুদ্ধে দাঁড়াইলা
জীবনের দীর্ঘকাল একাকী যুঝিলা।
... ...
হরিনাথ 'গ্রাম বার্ত্তা' নিদর্শন তার ॥[১১]

জমীদারের উৎপীড়ন ও নীলকরদের অত্যাচারের পরিচয় পাওয়া যায় মীর মশাররফ হোসেনের 'জমীদার দর্পণ' ও 'উদাসীন পথিকের মনের কথা'য়। 'জমীদার দর্পণ' নাটকে এরূপ একটি গান আছে। এই গানটি আবার 'সঙ্গীত লহরী'তে সংকলিত হয়েছে। সঙ্গীত লহরীর ৯ নং গানটি নিম্নরূপ :

মরি দুর্বল প্রজার পরে অত্যাচার
কতজনে করে করে জমীদার
... ...
প্রজা কত সহে, কিছু নাহি কহে,
মনে ভাবে এর নাহি উপায় আর ॥

এই গানটির সঙ্গে নীলকর টি. আই. কেনীর অত্যাচার-সম্পর্কিত কুষ্টিয়ার গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত একটি গ্রাম্য-ছড়ার বেশ মিল লক্ষ্য করা যায়। ছড়াটির মিলাত্মক অংশটুকু হলো :

হায়রে, প্রজার পরে কত অত্যাচার
নীলকর আর জমিদারে করেছে বারবার ।। [১২]

মীরের স্বদেশপ্রেমের গানে আমরা দেখতে পাই স্বদেশের চিন্তা, স্বদেশ-বাসীর জ্ঞান-গরিমা, তাঁদের আত্ম-জাগরণের কথা। আবার এরই পাশাপাশি স্থান পেয়েছে ইংরেজ মাহাত্ম্য—বিশেষ করে মহারানী ভিক্টোরিয়ার গুণগান ও তাঁর রাজত্বের স্থায়িত্ব কামনা এবং জমীদার ও নীলকরদের অত্যাচার থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্যে মহারানীর অনুগ্রহ লাভের প্রার্থনা। বিদেশী শাসক-গোষ্ঠীর অধীনতা পাশে বাঁধা যাদের চরণ তাদের স্বাদেশিকতার বক্তব্য মানেই ঐ শাসক গোষ্ঠীকে অস্বীকার করা। কিন্তু মীরের রচনায় এই এক আশ্চর্য দিক—একই গ্রন্থে একই সঙ্গে স্বাদেশিকতার কথা আবার বিদেশী শাসকের গুণগান-স্থায়িত্ব কামনা। ইতঃপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি মানুষের প্রতি মীরের মমত্ববোধের কথা। নীলকর ও জমীদারগণ প্রজা-সাধারণের উপর অকথ্য নির্যাতন চালাচ্ছে এটা লেখকের মনোবেদনার কারণ। আর এই অত্যাচার উৎপীড়ন থেকে মুক্তির পথ তিনি খুঁজে পেয়ে-ছিলেন মহারানীর কাছে নিবেদনের মাধ্যমে। নীলকর ও জমীদারদের অত্যাচার দমনের জন্যে তিনি মহারানীর দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এই নীলকর ও জমিদার-শ্রেণী যে মহারানী তথা ইংরেজ-রাজত্বের শাসন-শোষণের অন্যতম হাতিয়ার এই বাস্তব ঐতিহাসিক সত্য মীরের উপলব্ধিতে ধরা পড়েনি। সমাজ সম্পর্কে এটি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর সীমাবদ্ধতাই প্রমাণ করে। তবুও উৎপীড়িতের প্রতি তাঁর যে মমত্ববোধ তার একটা স্বতন্ত্র মূল্য আছে।

'সঙ্গীত লহরী'র কয়েকটি গানে ব্যঙ্গরসের পরিচয়ও পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ব্যঙ্গাত্মক রচনা মীর-সাহিত্যের অন্যতম একটি উল্লেখ-যোগ্য দিক। তাঁর 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী' এবং 'বাজীমাতে' এই ধারার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। 'সঙ্গীত লহরী'র ১৩, ৫৩, ৬০, ৬২ ও ৬৪ সংখ্যক গানে ব্যঙ্গরসের যথার্থ পরিচয় মেলে। তবে মীর-সাহিত্যে এই বঙ্গরস সব সময় যে একই সমতলে চলেছে, তা নয়। তাঁর নির্মল সূক্ষ্ম

ও বুদ্ধিদীপ্ত হাস্যরসে মাঝে মধ্যে স্থূলতাও প্রকাশ পেয়েছে। যেমন ৫৩ সংখ্যক গানে আছে—

আর বাঁচিনা প্রাণ সইরে, পোড়া শীতে মজাইল।
অভাগার ভাগ্যতে বিধি, বুঝি এই লিখে ছিল॥
কাপে অঙ্গ থরথর,
বুঝি গায়ে এল জ্বর,
কারে বলি ধর ধর ভাগ্যে কেহ না জুটিল॥
বুকে বুকে মুখে মুখে,
কতজন আছে সুখে,
(কেবল) কান্দি আমি মনোদুঃখে, এবারকার শীত একা গেল॥

তবে শুধু 'সঙ্গীত লহরী'তে নয় মীরের সাহিত্য-কর্মের অন্যত্রও মাঝে মধ্যে স্থূলতার পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন 'বাজীমাত'-এ হিন্দুবেশী মনিরদ্দীর সত্য পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হয় এ-ভাবে :

চক্ষে পড়ে শরীরের কোন এক স্থান
দেখে কহে নহে এই হিন্দুর সন্তান।

মিশ্রভাবের গান

সঙ্গীত লহরীর বিবিধ রচনার মধ্যে ৩৩ ও ৪০ নং গান দুটি উল্লেখযোগ্য। প্রথমটিতে 'তুইরে কাঞ্চন ভবে আদরের ধন' বলে অর্থের মাহাত্ম্য কীর্তন করা হয়েছে এবং দ্বিতীয়টিতে মীর মহাম্মদ আলীর প্রশস্তি গীত হয়েছে। মীর মহাম্মদ আলী ফরিদপুরের পদমদীর জমিদার ছিলেন। মশাররফ হোসেন এই স্টেটেরই নায়েব ছিলেন। এ ছাড়া পদমদীর নবাববাড়ির সঙ্গে মীরের আত্মীয়তার সম্পর্কও ছিল। "১২৮৪ সালের ২১শে ভাদ্র তারিখে শ্রীযুক্ত নবাব মৌলবী মীর মহাম্মদ আলী খেলাফত লইয়া কলিকাতা হইতে বাটি আসিবার দিনে" নবাবের বিভিন্ন কর্ম ও গুণাবলী কীর্তন করে এই দীর্ঘ প্রশস্তি গীতিমূলক 'উপহার' প্রদত্ত হয়।

'সঙ্গীত লহরী'র ৩,১৮, ৩০ ও ৮৬ সংখ্যক গানে রমণীর বিভিন্নমুখী রূপ— রমণীর মাহাত্ম্য অর্থাৎ রমণী হৃদয়ের রহস্য মশাররফ হোসেন তাঁর

নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছেন। যেমন ৩ সংখ্যক গানে রমণীর মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে এই ভাবে—

রমণী রতনে, বিধি সযতনে
নিরজনে গড়িয়াছে।
তাই যত ধনী, হয়ে অভিমানী
মানের গুমানে এত বাড়িয়াছে॥
মুনি ঋষি রত, যে শিব সাধনে,
তিনিও আশ্রিত রমণী চরণে,
ব্রজে কেলে সোনা, নিকুঞ্জ কাননে,
রমণীর পায় পড়িয়াছে॥

রমণীর ছলনাময়ী রূপটি লেখকের কাছে ধরা পড়েছে এ-ভাবে :

আমি জানি জানি প্রিয়ে জানি তোমার মন
রেল-চক্র মত ঘোরে, আবার ফেরে অনুক্ষণ॥
তোমার যে ভালবাসা, নবনদীর কুলে বাসা,
ক্ষণমাত্র নাই ভরসা—ঘটে কি কখন॥
যখন যার কাছে বস, সেই ভাবে আমারই বশ,
তুমি যারে ভালবাস, জানে কোন জন॥

৩০ সংখ্যক গানে আছে :

অবলা সরলা বলে যে করেছে বর্ণন
তার মত বোকা আর নাহি দেখি ত্রিভুবন
তবে যা আছে মুখেতে কিন্তু,
অন্তরে গরল॥

এইসঙ্গে নারী জাতির নিন্দে করা হয়েছে ২৫ সংখ্যক গানে—

নারী জেতের মুখে ছাই,
ও বালাইর নাম করিতে নাই,
ভব মেলার ওরা সবাই
বিচ্ছেদের ব্যবসা করে॥
বিধি মিলাল তায়,
করি সখী কি উপায়,
প্রেমানলে প্রাণ দয়॥

এই অসম-বিবাহ আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় বাল্য-বিবাহ এবং তার সমস্যার কথা। মশাররফ হোসেনের 'বসন্তকুমারী নাটকে'ও এই ধরনের অসম-বিবাহের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তবে মনে হয় মীরের এই রূপ গান রচনার পেছনে তাঁর ব্যক্তিজীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতাই কাজ করেছিল বেশী পরিমাণে।[১৩] মীরের মিশ্রভাবের সঙ্গীতে বিচিত্র ধরনের গানের সমাবেশ পরিলক্ষিত হয়। তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় ভণ্ডপীরদের ভণ্ডামী; ধর্মের মুখোশ পরিহিত ছদ্মবেশী লম্পটদের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরা হয়েছে ১০ সংখ্যক গানে :

কুবাসনা যার মনে; তার উপাসনা কি ?
মনে এক মুখে শুধু হরি বলে ফল কি ?
... ...
সতীর সতীত্ব ধন হরিবারে করে পণ
মুখে বিভু পদে মন, এদের অন্তকালে হবে কি ?

৯০ সংখ্যক গানে এক দীর্ঘ বর্ণনায় এই ধর্মীয় ভণ্ডামীর চিত্রটি পরিষ্কার ফুটে উঠেছে—

ভাইরে এ কালে কার
আর ধর্ম্ম রইলনা
... ...
গরু খায় হিন্দু হয়ে
আবার শুয়োর চাক্ষে মুন্সী ভায়ে,
ভট্টাচার্য্যের মুরগীর আড়ত,
চামড়ার কারখানা
... ...
দুই এক গণ্ডা পয়সা পেলে,
এরা ধর্ম্ম কর্ম্ম শিকেয় তুলে,
সকলি করিতে পারে,
কিছু আট্‌কে না ।।
হিন্দু, খৃষ্টান শ্লাম জাতি
সকল জেতের এই গতি
পয়গম্বর, দেবতা আদি
কেহ আর মানেনা ।।

মুখে ধর্মের নাম নিয়ে নারীর সতীত্বহরণ, হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের (ধর্মীয়) ভণ্ডপীরদের এহেন চরিত্রের পরিচয় মীরের 'জমীদার দর্পণ, নাটকেও পাওয়া যায়।

নারী জাতির এই রহস্য বিশ্লেষণের পাশাপাশি রমণীয় যৌবন সম্পর্কেও মন্তব্য আছে এতে। ৮৬ সংখ্যক গানে লেখক নারীর যৌবন মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন এইভাবে :

আর নারীর যৌবন জলন্ত আগুন,
কত পুরুষ পোকা, খেয়ে ধোকা,
পুড়ে হল খুন, (আগুন) পুড়ে হল খুন,
যখন সময় হল, তেজ কমিল
রক্ষা পেল কতজন ॥

নারী হৃদয়ের এই বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে পুরুষ হৃদয় সম্পর্কেও তিনি মন্তব্য করেছেন। 'সঙ্গীত লহরী'র ৭, ৩১ ও ৪২ সংখ্যক গানে নারীর দৃষ্টিতে পুরুষ চরিত্রের স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন তিনি। যেমন ৭ সংখ্যক গানে আছে—

পাষাণ সমান প্রাণ, পুরুষ নিদয় অতি
মনে এক মুখে আর, ভিন্ন ভাব অন্যমতি ॥
কত কথার কত ছলে,
রমণীরে কত ছলে,
হাসি হাসি কত বোল বলে
মজায় অবলা জাতি ॥

৩১ সংখ্যক গানে আছে—

...পুরুষ ভ্রমরা জাতি, কেবা নাহি জানে
কত ছলে অবলারে মজাইছে প্রাণে
পাষাণে গঠিত দেহ, লোহার গড়া মন ॥

এই সঙ্গে নারী-পুরুষের অসম সম্পর্ক অর্থাৎ অসম-বিবাহ সম্পর্কেও একটি গান আছে এতে। ৪ সংখ্যক গানে অসম-বিবাহের মর্মন্তুদ চিত্রটি লেখক তুলে ধরেছেন এভাবে :

স্বজনী লো, মুখের কথাতে কিবা হয়
প্রাণে আর কত সয়, অবলা সরলা কোথা—
শুধু কথায় ভুলে রয় ॥
নবীনা যুবতী আমি,
অন্তদন্ত হারা স্বামী
অন্ত জানেন অন্তর্যামী,
মধু প্রেম বিষময়
মন যারে নাহি চায়,

এ-গ্রন্থের মিশ্রভাবের গানে ইংরেজী পদের সুরে একটি গান(৭৬) এবং মেয়েলী গীতের (গ্রাম্য স্ত্রী লোকের গানের সুরে) অনুকরণে দুটি গান (৭৪, ৭৫) আছে। এখানে অধ্যাত্মবাদের একটি গানে (৮৪) সমাজের কিছু বাস্তব চিত্রের পরিচয়ও পাওয়া যায়। যেমন :

এ ভবের ভাব দেখি ভাই চমৎকার
তারি লীলা বুঝে উঠা ভার ॥
... ...
কার ধানে ধনে পূর্ণ আছে ঘর,
কেউ এক মুঠ্ অন্নেরই তরে ফিরছে শত ঘর,
(ভোলা মন) ফিরছে শত ঘর,
কেউ শাল-বুনাতে ঘৃণা করে,
কার ছেড়া কাঁথা সার ॥
... ...
কার ফুল বিছানা, কার ফুল বিছানায়,
ঘুম আসে না, গাছতলায় কার রাত কাবার ॥

বাউল-জাতীয় গানগুলিই 'সঙ্গীত লহরী'র শ্রেষ্ঠ ও স্থায়ী সম্পদ। অধ্যাত্ম-ভাব সমৃদ্ধ ১৫টি বাউল গান এতে সংকলিত হয়েছে। বাউল-ভাবের এই গানগুলি অনবদ্য ও শিল্প-সুষমমণ্ডিত। বাংলা সাহিত্যে অনেকেই সখের বাউল গান রচনা করেছেন। এই সখের বাউল গান রচয়িতার মধ্যে মশাররফ অন্যতম শ্রেষ্ঠ। তিনি বাউল গান রচনার প্রেরণা ও উৎসাহ লাভ করেন কুমারখালীর সাহিত্য-সাধক কাঙাল হরিনাথের নিকট থেকে। মশাররফ হোসেন কেমন করে বাউল গান রচনায় উদ্বুদ্ধ হন, তার

একটি চমকপ্রদ কাহিনী আছে। কাঙাল হরিনাথের শিষ্য জলধর সেন সেই ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে :

"আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, সেই সময়ে একদিন মীর মশাররফ হোসেন কুমারখালীতে কাঙালের কুটীরে উপস্থিত হইলেন এবং ফিকির চাঁদের দলকে তাঁহার বাড়ীতে লইয়া যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। কাঙাল সম্মত হইলেন। তিনি বলিলেন, "দলের নিয়মানুসারে দলের লোকেরা তোমার বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করিবে না। তোমার বাড়ীতে গান শেষ করিয়া দলের লোকেরা সেই রাত্রিতেই বাড়ী ফিরিয়া আসিবেন; তোমার বাড়ীতে তাঁহারা এক ছিলিম তামাকও খাইবেন না।" মশাররফ বলিলেন "সে কি কথা! তা কি হয়?" কাঙাল বলিলেন "তবে তুমি যদি এই দলভুক্ত হও, তবে তাঁহারা তোমার বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করিতে পারেন।" মশাররফ হাসিয়া বলিলেন "আমিত গান করিতে জানিনা।" কাঙাল উত্তর করিলেন "গান করিতে জাননা বটে কিন্তু গানত লিখিতে জান।" মীর মশাররফ বলিলেন "তাহা হইলে আমি দল-ভুক্ত হইলাম। এখনই গান লিখিয়া দিয়া যাইতেছি।" এই বলিয়া তিনি তখনই গান লিখিতে বসিলেন।"[১৪]

বাউল গান রচনায় মশাররফ সরাসরি কাঙাল হরিনাথের দ্বারা প্রভাবিত হলেও লালন ফকিরের প্রচ্ছন্ন প্রভাব তাঁর উপর পড়েছিল—"মীর রচিত বাউল গানে কাঙালের প্রভাবই অধিক ও সরাসরি। তবু লালনের গান যে তার মনে ছাপ ফেলেনি—হৃদয়ে দাগ কাটেনি এ কথা কে বলবে! মীরের দুয়েকটি গানে লালনের গানের প্রভাব ও মিল আবিষ্কার করা যায়।... মীর সাহেবের 'সঙ্গীত লহরী'র একটি গানে লালন ফকিরের নাম পাওয়া যায়। গানটির অংশবিশেষ হলো এই :

আরে ভাই না পাই দিসে, কলির শেষে,
কিসে কার মন মজেছে।
ফিকির চাঁদে, আজব চাঁদে,
কোথা আর পাগল কানাই;
লালন গোঁসাই; সব সাঁই এতে হার মেনেছে।[১৫]

সতীশচন্দ্র মজুমদারের "কুড়নো সঙ্গীত" গ্রন্থেও লালনের সঙ্গে মীরের পরিচয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। কাঙালের সঙ্গে লালনের পরিচয় সূত্র

ধরেই সম্ভবতঃ লালনের সঙ্গে মীরের আলাপ-পরিচয়।[১৬] মীরের বাউল গানগুলোর মধ্যে ৮১নং গানটিকে শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান দেওয়া যেতে পারে। বক্তব্য ও প্রকাশভঙ্গিমায় গানটি চিত্তাকর্ষক। অধ্যাত্মভাবজনিত চিন্তার প্রতিফলন ঘটেছে এতে। যেমন :

রবেনা দিন চিরদিন
সুদিন কুদিন একদিন দিনের সন্ধ্যা হবে।
আমার আমার সব ফক্কিকার,
কেবল তোমার, নামটি রবে।
হবে সব লীলা সাঙ্গ,
সোনার অঙ্গ ধূলায় গড়াগড়ি যাবে।।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, কাঙাল হরিনাথের সঙ্গে আলাপ প্রসঙ্গে এক বসাতে এই গানটি লিখেই তিনি ফিকির চাঁদের দলের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। মীরের এই গানটি এতই জনপ্রিয় হয়েছিল যে গানটি স্বয়ং কাঙাল হরিনাথের বলে প্রচলিত হয়ে গিয়েছিল। এবং তাঁর নামেই এটি চালানো হয়েছে।[১৭] এমনকি এই গানটি কাঙালের সঙ্গীত সংগ্রহ পুস্তকেও স্থান পেয়েছে।[১৮] এতে মশাররফ হোসেনের গানের ভাব-ঐশ্বর্য এবং জনপ্রিয়তাই প্রমাণিত হয়।

বাউলেরা জাত ধর্মের উর্ধ্বে। জাত-ধর্ম-সম্প্রদায় নির্বিশেষে সর্বধর্মের মানুষের একটি অভিনব মিলন ক্ষেত্র রচনাই তাদের লক্ষ্য। তাই তাঁরা বলেন :

জাত না গেলে পাইনে হরি
কি ছার জাতের গৌরব করি। —(লালন)

এ ক্ষেত্রে প্রায় একই সুর ধ্বনিত হয়েছে মশাররফ হোসেনের গানে—

মিছে ভাই জাতির বিচার
আচার-ব্যাভার, মিছেরে
এই দুনিয়া দারী।
কেননা, ...
দেখ কৃষ্ণ, বিষ্ণু, মুসা, ঈসা,
নানক, নিতাই জটাধারী।

অরে ভাই অন্নপূর্ণা, বিবি ফাতেমা,
মোহাম্মদ পয়দা তাঁরি।

তাই—

অরে নাই ভেদাভেদ, বর্ণ বিভেদ
কিছু প্রভেদ কাছে তাঁরি
মশা কয়, ধোকায় পড়ে বোকা হয়ে,
করি আমরা মারামারি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এই গানটির জন্যে লেখককে বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল।[১৯] ভণ্ড ধার্মিক, প্রতারক 'মিয়ে-মোল্লা', 'বামুন-কায়েত'-দের মুখোশ উন্মোচন করে দিয়েছেন একটি গানে। ৯০ সংখ্যক গানে তাদের চরিত্র বিশ্লেষণ করা হয়েছে এভাবে:

দুই এক গণ্ডা পয়সা পেলে
এরা ধর্ম্ম কর্ম্ম সিকেয় তুলে,
সকলি করিতে পারে,
কিছু আটকে না।

কুমারখালীতে 'ফিকির চাঁদের' দলের দেখাদেখি 'আজব চাঁদ', 'রসিক চাঁদ' ইত্যাদির আবির্ভাব হয়। প্রথমে ধর্মভাবের প্রভাব থাকলেও পরে চাঁদ সকল উত্তর চাপান খেয়ে গালাগালির সূত্রপাত করেন। শেষে হাতাহাতি মারামারি। বাউল ভাব-সাধনার নামে অশ্লীল কর্ম এবং সঙ্গীতের নামে খিস্তি-খেউর মীরের পরিশীলিত ও শুদ্ধ মানসকে ক্ষুণ্ণ করেছিল। তাই ৮৯ সংখ্যক গানে মীরের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হয়েছে এভাবে:

ফিকির চাঁদে, আজব চাঁদে,
রসিক চাঁদে সব মেতেছে।
কোথা আর পাগল কানাই, লালন গোঁসাই,
সব সাঁই এতে হার মেনেছে।
... ...
ওরে আসল ফসল, কিবা নকল,
সকল চাঁদে দাগ রয়েছে।

এতে কি উত্তর চাপান,
বদ জোবান করে গাল দিতে আছে।
ওর ভাই তোরা হয়ে দরবেশ; করিস বিদ্বেষ,
এই উপদেশ কে দিয়েছে।
তোদের শিক্ষা গুরু আসল গুরু
বলতে মশার ভয় কি আছে।।

এ-গ্রন্থে সংকলিত গানগুলি ছাড়াও সম্ভবতঃ আরও কিছু বাউল গান তিনি রচনা করেছিলেন, যা হয়তো 'সঙ্গীত লহরী'র ২য় খণ্ডে সংকলন করার ইচ্ছে তাঁর ছিল। তাই এই গ্রন্থকে তিনি উল্লেখ করেছেন '১ম খণ্ড' বলে। মীরের বাউল গানগুলি উচ্চভাব সম্পন্ন বাউল গানের পর্যায়ভুক্ত। তাঁর এই ধরনের কিছু কিছু গান গ্রামাঞ্চলে গীত হতো, নির্ভরযোগ্য সূত্রে এমন খবর পাওয়া গেছে।[২০] তবে কুষ্টিয়া অঞ্চলে অন্যান্য বাউল গানের, বিশেষ করে লালনের সর্বগ্রাসী বাউল-প্রতিভার পাশাপাশি এই গানগুলোর স্থায়িত্ব ও সুপ্রচার সম্ভব হয়নি। সম্ভবতঃ এ কারণেই দুর্গাদাস লাহিড়ী সংকলিত 'বাঙ্গালীর গান' বা সমসাময়িক কোন সঙ্গীত-সংকলনে মশাররফ হোসেনের কোন গান সংকলিত হয়নি।

'সঙ্গীত লহরী'তে মশাররফ হোসেনের যে পরিচয় আমরা পাই, তাতে তাঁকে 'কবি' বা 'গীতিকার' না বলে 'পদ্যকার' বললেই যথার্থ হবে বলে মনে হয়। গদ্যই ছিল তাঁর বিচরণের স্বচ্ছন্দ ক্ষেত্র। এই তুলনায় পদ্যে তাঁর কবি-প্রতিভা নিষ্প্রভ, বৈচিত্র্যহীন ও গতানুগতিক। তাঁর কোন কাব্য গ্রন্থেই তাঁর কবি-প্রতিভার উল্লেখযোগ্য পরিচয় পাওয়া যায়না। তবে তাঁর অন্যান্য কাব্য-গ্রন্থের প্রেক্ষিতে বিচার করলে 'সঙ্গীত লহরী'র একটা স্বতন্ত্র মূল্য আবিষ্কার করা যায়। মীর মশাররফ হোসেনের কাব্য-রচনার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন তাঁর এই 'সঙ্গীত লহরী'।

তথ্য-নির্দেশ

১ লেখকের 'বিষাদ-সিন্ধু' গ্রন্থের ১ম খণ্ড ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। কিন্তু তিন খণ্ডে সমাপ্ত সম্পূর্ণ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দে।

২ 'সঙ্গীত লহরী'তে মোট ৯১টি গান সংকলিত হয়। কিন্তু আসলে এতে গানের সংখ্যা ৮৮। তিনটি গান একাধিক বার ছাপা হয়েছে। এর ৪৮ ও ৬৭, ৪৬ ও ৬৮ এবং ৪৯ ও ৬৯ নং গান অভিন্ন।

৩ 'উনিশ শতকে বাঙ্গালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা' (১ম খণ্ড), ড. ওয়াকিল আহমদ, (ঢাকা, ১৯৮৩), পৃ. ২৬৮

৪ বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দ, ৪র্থ ত্রৈমাসিক খতিয়ান, ক্রমিক সংখ্যা ৬৮৩৫, পৃ. ২২–২৩

৫ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সা-স চরিতমালা ২৮–২৯' (কলিকাতা, ১৩৭২), পৃ. ৪০, ৫১–৫৩

৬ জনাব এম আশরাফুল হক সাহেবের সৌজন্যে প্রাপ্ত 'সঙ্গীত লহরী' কাব্য-গ্রন্থটি জনাব অধ্যাপক আবুল আহসান চৌধুরীর সম্পাদনায় ১৯৭৬ খ্রীস্টাব্দে কুষ্টিয়া থেকে প্রকাশিত হয়। প্রকাশক—কল্যাণ মিত্র, গণলোক প্রকাশনী, মজমপুর, কুষ্টিয়া।

৭ B.L.C., Report on the Bengal Library for the year 1887, p. 8

৮ দ্রষ্টব্য—সঙ্গীত লহরীর ৮৫ সংখ্যক গান। গানের কয়েকটি চরণ নিম্নরূপ :

মিছে ভাই জাতির বিচার, আচার ব্যাভার
মিছেরে এই দুনিয়া দারী।

... ...

তার কাছে নাহি ভিন্ন, কেহ অন্য
সকলই তার কারিগরী।
দেখ কৃষ্ণ, বিষ্ণু, মুসা, ইসা,
নানক; নিতাই জটাধারী।
অরে ভাই অন্নপূর্ণা, বিবি ফাতেমা,
মোহাম্মদ পয়দা তাঁরি॥
অরে নাই ভেদাভেদ, বর্ণ বিভেদ
কিছু প্রভেদ, কাছে তাঁরি

মশা কয়, ধোকায় পড়ে বোকা হয়ে,
করি আমরা মারামারি ।।

'সঙ্গীত লহরী', আবুল আহসান চৌধুরী সম্পাদিত, (কুষ্টিয়া, ১৯৭৬), পৃ. ৪৭–৪৮

৯ 'সুধাকর', চৈত্র ৯, ১২৯৬

১০ জলধর সেন, 'কাঙাল হরিনাথ', (কলিকাতা, ১৩২০)

১১ 'মীর মশাররফ হোসেন,' অধ্যাপক আশরাফ সিদ্দিকী, মাসিক মোহাম্মদী, ২৮শ বর্ষ ১ম সংখ্যা, কার্তিক ১৩৬৩, পৃ. ৫১

১২ 'কুষ্টিয়ার বাউল সাধক : আবুল আহসান চৌধুরী, (কুষ্টিয়া, ১৯৭৪), পৃ. ৩২

১৩ 'আমার জীবনী'তে উল্লেখিত লতিফুন্নেসার সঙ্গে মীরের বিবাহের কথা পাকাপাকি হবার পর লতিফনের পরিবার ষড়যন্ত্র করে চারিশত টাকা ঘুষ নিয়ে এক বৃদ্ধের সঙ্গে লতিফনের বিবাহ দেন। ফলে লতিফনের জীবন বিষময় হয় ওঠে। বিয়ের এক সপ্তাহের মধ্যেই লতিফন মারা যায়। এঘটনা মশাররফ হোসেনের মনে বেশ গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল।

১৪ জলধর সেন, 'কাঙাল হরিনাথ' (প্র. স. কলকাতা, ১৩২০), পৃ. ৩৯–৪০

১৫ লালন স্মারক গ্রন্থ : আবুল আহসান চৌধুরী সম্পাদিত (ঢাকা, ১৯৭৭), পৃ. ৫–৬

১৬ ঐ, পৃ. ৫

১৭ এ সম্পর্কে কাঙাল-শিষ্য দীনেন্দ্রনাথ কুমার রায় লিখেছেন—"আজ কাঙালের স্বর্গারোহণ-তিথিতে আমরা কতিপয় বন্ধু এখানে সম্মিলিত হইয়া তাঁহার গুণকীর্তন করিতেছি, —তাঁহার কথা স্মরণ না থাকলেও,—

"রবেনা দিন চির দিন, সুদিন-কুদিন, একদিন দিনের সন্ধ্যা হবে,
এই যে আমার আমার, সব ফক্কিকার ; কেবল তোমার নামটি রবে।"

তাঁহার এই স্মরণীয় সঙ্গীত আমাদের সকলকে একদিন না একদিন স্মরণ করিতে হইবে।''

—'সাহিত্য' (মাসিক পত্রিকা : সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত, আষাঢ় ১৩২০), কাঙালের স্মৃতিচর্চা, পৃ. ১৯৫

১৮ কাঙাল ফিকির চাঁদের বাউল সঙ্গীত (কলিকাতা, ১৩২৩), পৃ. ৫৮

১৯ দ্রষ্টব্য, এই প্রবন্ধের সূচনা পর্বের আলোচনা।

২০ 'সঙ্গীত লহরী', আবুল আহসান চৌধুরী সম্পাদিত, (কুষ্টিয়া, ১৯৭৬ পৃ. চব্বিশ।